বাইরে আসিও না



সায়ন মান্না

বাইরে আসিও না

সায়ন মান্না

BAISHE ASIO NA

A BENGALI SHORT STORY COLLECTION

By SHAYAN MANNA

লেখক: সায়ন মান্না

প্রকাশক: সায়ন মান্না

প্রচ্ছদ: সায়ন মান্না

রূপায়ণ: সায়ন মান্না

প্রথম ডিজিটাল সংস্করণ: আগস্ট, ২০২৬

উৎসর্গ

যার লেখা আকাশের পরিধি মাপার ক্ষমতা রাখে।

এই গ্রন্থের সমস্ত চরিত্র, ঘটনা, স্থান ও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বাস্তব কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, ঘটনা বা স্থানের সঙ্গে কোনো প্রকার মিল পাওয়া গেলে তা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ও কাকতালীয়।

এই সংকলনের কিছু গল্পে সহিংসতা, অপরাধ, যৌনতা, মৃত্যু এবং মানসিক স্বাস্থ্যের মতো সংবেদনশীল বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। এগুলোর উপস্থাপন কেবল গল্পের প্রয়োজনে; কোনো ক্ষতিকর আচরণকে সমর্থন বা উৎসাহিত করা লেখকের উদ্দেশ্য নয়।

সূচিপত্র

লেখক খুবই অলস তাই আর কোন পাতায় কী পাবে লেখার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। একটু দেখে নেবেন।

“The distinguishing mark of man is the hand, the instrument with which he does all his mischief.”

— George Orwell, *Animal Farm*

অস্কার

ঘামে ভেজা রুমালটা পকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে চেপে ধরে শাওন। কপালে ভাঁজ। ক্লান্তির নয়; বিপদের।

এখন যদি শাওন কলিংবেল বাজিয়ে বাড়িতে ঢোকে, তাহলে হয় আজ শাওনের শেষ দিন, নয়তো তার মা শান্তিদেবীর; যিনি আর যাই হোক, শান্ত থাকবেন না।

আঙুলটা শূন্যে অপেক্ষা করছে কলিংবেলের ধুলো ছুঁয়ে দেওয়ার জন্য। তার আগেই দরজার পাল্লা খুলে যায়। চোখাচোখি হতেই দু'জনেই থমকে যায়।

কাঠের সেই গণ্ডি যেন ভাগ করে রেখেছে দুই পৃথিবী। একদিকে মা; ভেঙে যাওয়া শিলালিপির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। অন্যদিকে ছেলে; তার ঠিক পেছনে নববধূকে নিয়ে।

মা কিছু বলার আগেই শাওন কেঁদে ওঠে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে,

"বিশ্বাস করো, আমি পালিয়ে বিয়ে করে আনিনি। তোমায় বলেই কাজে সেই গ্রামে গিয়েছিলাম। রাস্তা বুঝতে না পেরে ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। গ্রামের লোক আমাদের পিছন দিয়ে একসঙ্গে দেখে ভেবে বসে আমরা ঘনিষ্ঠ। তারপর জোর করে দিয়ে দিল বিয়ে। না হলে দু'জনকেই মেরে ফেলত।" বলে থামল শাওন। হাঁপাচ্ছে এখনও।

শান্তিদেবী বিশ্বাস করবেন কি করবেন না বুঝে উঠতে পারেন না। একবার ছেলের মুখের দিকে, একবার তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা সমবয়সী মেয়েটির দিকে তাকান। দু'জনের চোখেই জল।

তিনি কিছু না বলে চলে যান ভিতরে। একটু পর ফিরে আসেন বরণডালা হাতে। বরণ করে দু'জনকে তোলেন ঘরে, তারপর শান্ত গলায় বলেন,

"তোমরা শাওনের ঘরে যাও। বিশ্রাম নাও। তারপর কথা হবে।"

মায়ের কথামতন নিজেদের ব্যাগ নিয়ে যায় ঘরে। তারপর ঢুকে দরজা বন্ধ করতেই নূপুর এসে জড়িয়ে ধরে শাওনকে। হেসে বলে,

"আর একটু চালিয়ে গেলে অস্কারটা কিন্তু তোরই হতো আজ।"

সত্যি/সত্য

সৌরিতা আজ প্রায় তিন বছর পর অফিসে প্রমোশন পেয়েছে। আনন্দের খবরটা সবার আগে নিজের প্রেমিক রৌরীবকে জানাতেই ইচ্ছে হলো।

ফোন করার আগে একবার ইতস্তত করল সে। হয়তো এখন গেম খেলছে। এমন সময় বিরক্ত করতে ইচ্ছে করছিল না। আগের দিনই তো রাগের মাথায় খেলতে খেলতে বলছিল, "পোঁদ মেরে দেব।"

আর না ভেবেই ফোন করল সৌরিতা। রৌরীব ফোন ধরল।

"হ্যাঁ, বলো।"

"একটা খবর দেওয়ার আছে।"

"কী?"

"আমার আজ ফাইনালি প্রমোশন হয়েছে। আমি খুব খুশি! রাতে চাইনিজ আনি?"

"সত্যি? আমি খুব খুশি হয়েছি গো। তোমার পছন্দমতো যা ইচ্ছে এনো। আমিও কিছু নিয়ে আসব। আজ তো খুশির দিন"

"কোথায় তুমি?"

“আরে, কাল যে ছেলেটা বারবার গালাগাল করছিল, তার পোঁদ মারছি বসে। খুব উড়ছিল।”

সৌরিতা হেসে ফেলল। রৌরীবের মুখের ভাষা নোংরা হলেও সে বুঝতে পারল, নিশ্চয়ই গেম খেলছে।

ফোন কেটে দিল সৌরিতা।

রৌরীব মৃদু হাসল। তারপর রেখে দিল ফোনটা।

তার সামনেই রক্তভেজা টাইলসের ওপরে শুয়ে ছিল এক পুরুষ। নগ্ন। জ্ঞান হারিয়েছে যন্ত্রণায়।

লটারি

লটারির নম্বরে চারটে সংখ্যা যেন গাঢ় হয়ে জ্বলজ্বল করছে। তিন, আট, চার, নয়।

মৃদুল একবার সংখ্যাগুলোর ওপর জিভ বুলিয়ে যেন স্বাদ নিল। তারপর খবরের কাগজটা উল্টে একেবারে নিচে আঙুল নামিয়ে খুঁজতে লাগল সেই চারটি সংখ্যা। না, নেই।

ডানাকাটা পরীর মতো মুখটা কাচুমাচু করে টিকিটটা জামায় মুছে পকেটে রাখল। তারপর মাথা ঘুরিয়ে তাকাল স্বর্ণালীর দিকে। স্বর্ণালী চিৎকার করছে। আনন্দে।

এক অঙ্কের ব্যবধানে স্বামী এবং স্ত্রীর ভাগ্য আলাদা হয়ে গেছে। স্ত্রী এগিয়ে, স্বামী পিছিয়ে।

একটানে মৃদুল স্বর্ণালীর হাত থেকে লটারির রঙিন টিকিটটা ছিনিয়ে নিল। নিজের টিকিটটাও পকেট থেকে বের করে দুটোই ছিঁড়ে ফেলল। একসাথে।

স্বর্ণালী মৃদু ভ্রু কুঁচকাল। তারপর কি যেন লক্ষ্য করে হেসে উঠল। মৃদুল হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে। ছিঁড়ে যাওয়া টিকিটের একটা অংশ মাটি থেকে তুলে তার হাতে দিল স্বর্ণালী।

তারিখটা।

মৃদুল দ্রুত নিজের টিকিটের অন্য টুকরোটার দিকে তাকাল। তারপর স্বর্ণালীর টিকিটের তারিখের সঙ্গে মিলিয়ে দেখল। বজ্রাহত মৃদুল। সকাল থেকে তারা আজকের ড্র-এর টিকিট মিলিয়ে চলেছিল। খেয়ালই করেনি, যে ফলাফলটা তারা দেখছিল, সেটা ছিল গতকালের।

মরচে

অন্ধকারের রং তখন কালো। নীল নয়, নয় সাদা। পুরো কালো; যেন এই অন্ধকারেই লুকিয়ে জগতের জঘন্য কোনো হিংসা বা প্রতিহিংসা।

জানলার মরচে ধরা গ্রিলগুলো শক্ত করে ধরে আছে কালশিটে মাখা দুহাত। মুখের কোমল অবয়ব যেন জানলার ফাঁক বেয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। পারে না, গোঙাতে থাকে। জানলার ঠিক নিচেই এক সাদা পায়রা শুয়ে; নগ্ন, সমস্ত পালক ঝরে গেছে। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কিছু কালো, বিশ্রী কাক। প্রত্যেকে মিলে গিলে খাচ্ছে পায়রাকে। রক্তে ভিজে যাচ্ছে রাস্তা, কিন্তু কেউ নেই।

পায়রার গোঙানি শুধু শুনতে পায় অহনা। কিন্তু দেখতে পায় না, বাঁচাতে পারে না; শুধু কাঁদতে পারে। দুচোখ দেখতে পায় না, তবে বুঝতে পারে।

যাইহোক

আচ্ছা, আপনার কখনও মন ভেঙেছে? বা বিশ্বাস? কখনও মনে হয়েছে যে আমিই কেন? এত লক্ষ কোটি মানুষের মাঝে আমিই কেন? ইচ্ছে হয়েছে নিজেকে শেষ করে ফেলার? কিন্তু কেন করবেন? আপনি তো ভুল করেননি। রাস্তায় কোনো কুকুর বা বিড়াল দেখবেন, যতই আপনি আদর করুন, ভালোবাসুন, খেয়াল রাখুন, যেই অন্য কেউ আপনার থেকে কিছু মিলিমিটার বেশি করে দেবে, তারা আপনাকে চিনতেও পারবে না। তখন কি আপনি অসুর হয়ে যাবেন আর অপেক্ষা করবেন বোধ হওয়ার? না, নিশ্চয়ই?

যাইহোক, আমি আদিত্য। কী করি, কোথায় থাকি, সে বলা অহেতুক তাই নাহয় থাক সেসব। তবে এত কথা কেন বললাম, বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই? এই চার ঘণ্টা পাঁচ মিনিট হলো আমার বিশ্বাস ভেঙেছে। ভেঙেছে বলা ভুল, যেন চুরমার হয়ে গেছে ফুচকার মতো।

বাথরুম থেকে শাওয়ারের আওয়াজ পাচ্ছেন? পাবেন না। আপনি তো পড়ছেন, শুনবেন কী করে? যাইহোক, বাথরুমে যে আছে তার নাম তিয়াশা। প্রায় পাঁচ বছর আমাদের সম্পর্কের বয়স। তবে জানেন? আজ মাঝরাতে বাকি পাঁচজনের মতো আমিও শুয়েছিলাম। হঠাৎ কিসের যেন শব্দ আসে কানে। যেন তিনটে শব্দ শুনলাম, "আই লাভ ইউ"। ভাবলাম আমাকেই বলছে। একটু মনে মনে হেসে চোখ খুলে আমি থ হয়ে গেলাম।

তিয়াশার মুখ যেন স্ক্রিনের আলোয় উজ্জ্বল। স্ক্রিনের ওপারে একজন নগ্ন লোমশ পুরুষ তাকে নিজের শরীর প্রদর্শন করছে, আর তিয়াশা তা দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমি চোখ বন্ধ করলাম।

কথায় বলে, প্রথম সব অনুভূতি নাকি খুব বিশেষ হয়। কিন্তু এই যা হলো, তা বিশেষ না হলেও আমাকে মুহূর্তেই শেষ করে দিয়েছে। আগে শুধু পড়াশোনা মেরেছে, আজ প্রেমিকাও মারল আমাকে।

যাইহোক, বর্তমানে আসা যাক। ঠিক আমার পাঁচ গোনার মধ্যে আপনি বীভৎস চিৎকার শুনতে পারবেন। তৈরি তো? শুরু করলাম।

পাঁচ

চার

তিন

দুই

এক

শুনতে পাচ্ছেন? পাচ্ছেন না মানে? বাড়িতে আমার একটা বিশেষ তরল ছিল। শীতেও উষ্ণতা পৌঁছে দেয় চামড়া পেরিয়ে। আমি তো খুব ভালো, তাই মিশিয়ে দিয়েছি জলে। যাতে না ঠান্ডা লাগে। বাকি আর বৃত্তান্ত নাই বা দিলাম। তরলের নাম আপনি বুঝে নিন। পাঠক মানুষ অবশ্যই বুঝদার। ঠিক বুঝে নেবেন।

যাইহোক, আমি গান করি একটু,

"আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে....."

শিকার

চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দময়ন্তী। ছুটে আসে অনুভব। দময়ন্তীর মাথা কোলে তুলে বসে মাটিতে। পাশের টেবিল থেকে জলের বোতল খুলে জলের ছিটে দেয় মুখে। পাতা নড়ে ওঠে। দময়ন্তী কেঁদে ওঠে। শক্ত করে জড়িয়ে ধরে তাকে। ফোন পড়ে যায় হাত থেকে। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে দময়ন্তীর মা, অবন্তিকা সেন। প্রাক্তন সাংবাদিক।

তারপর আসে লোক, আসে পুলিশ। যেতে হয় হাসপাতাল, করতে হয় সই, পোড়াতে হয় দেহ। তারপর আসে ইন্স্যুরেন্স এজেন্ট। মায়ের নামে করা ছিল পঁচিশ লাখের জীবন বীমা। এখন সবটাই তার।দময়ন্তী নিতে চায় না তবুও নিতে হয়। ঘরের নিস্তব্ধতা রঙ বদলায়।

" ডিনার আজ বাইরে হোক? " দময়ন্তী হাসে।

" হোক। এতদিনের একটা নাটক পূর্ণতা পেয়েছে একটু উপভোগ না করলেই নয়। "

" মিস্টার সেন কিন্তু পাবে পঞ্চাশ হাজার"

" হ্যাঁ অবশ্যই। উনি না থাকলে এত কিছু হতো ? আমাদের আর ভাবতে হবে না কিছু বছর। অনেক আছে আমাদের। অনুভব কপালে চুম্বন করে হেসে ওঠে। " এত সুন্দর পরিকল্পনা সাজাতেও কিন্তু সময় কম যায়নি।

মায়ের জন্য আমাদের ব্যবসায় সমস্যা , ঘরে সমস্যা। প্রায় ধরেই ফেলেছিল আমরাই পুরো শহরের নারী পাচারের সঙ্গে যুক্ত”

“ কিন্তু সেটা হয়নি। তার আগেই খেলা ঘুরিয়ে দিয়েছি। বরং আমাদের আরও লাভ হলো পঁচিশের।”

“ লাভ আমাদেরও হলো। আপনাদের স্বীকারোক্তিতে” তাদের দৃষ্টির আড়ালে সোফার ভিতর রাখা ছিল একটা ফোন। সেখানে থেকে বলে ওঠে এক পুরুষালি কণ্ঠ, “ ইউ আর আন্ডার আরেস্ট মিস্টার এন্ড মিসেস সেন ”

জুজু

আজ রজত বেশ খুশ মেজাজে। হাতে বিয়ারের বোতল আর চিপস। ঠোঁটে জ্বলছে সিগারেট আর মাটিতে পড়ছে ছাই। নতুন বিয়ে হয়েছে বলে কথা। একটু না গা গরম করলে মাঠে খেলতে পারবে না তো।

ছাদের অন্ধকারে তখন চাঁদের বিভীষিকা জায়গা করে নিচ্ছে। কোথাও সাদা, কোথাও কালো। ঠিক যেন নিজেদের মধ্যেই লুকোচুরি খেলছে। রজত দাঁড়িয়ে একধারে। ইটের পাঁচিলে রাখা বিয়ারের বোতল আর ফোন।

সিগারেটে শেষ টান মেরে আঙুলের ফাঁকে রেখে ছুড়ে দেয়। মনে পড়ে, রাগের মাথায় ঠিক এভাবেই একদিন একটা কালো বিড়ালকে ধাক্কা দিয়েছিল। শরীরটা যত নীচে নেমেছিল, ততই যেন নক্ষত্র হয়ে মিলিয়ে গিয়েছিল অন্ধকারে। সেইভাবেই পুড়ে যাওয়া কাগজের দেহটা মাটিতে ধাক্কা খায় ঠিক পনেরো সেকেন্ড পর। পনেরোটা ঘর পেরিয়ে নীচে পড়তে সময় লাগবেই।

রজত হাসে; তারপরই আবিষ্কার করে নিজেকে শূন্যে। মাটিতে পা নেই; শুধু শূন্য।

“ধাপ্পা।”

শব্দটা কানে আসতেই সজোরে ভূমিষ্ঠ হয় রজত। টেবিল থেকে কাঁচের গ্লাস পড়লে যেমন চুরমার হয়ে যায়, তেমনই ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে থাকে তার শরীর। চারদিকে রক্ত আর তারপর; চিৎকার।

ছাদে দাঁড়িয়ে এখনও অস্পষ্ট এক ছায়ামূর্তি। অন্ধকারে না দেখা যায় মুখ, না তাকে। হাতে রুমাল জড়িয়ে এক মুহূর্তের জন্য তুলে নেয় বিয়ারের বোতলটা, তারপর নীচে রেখে দেয় একটা ছবি। বোতলটাও আবার আগের জায়গায় নামিয়ে রাখে।

ছবিতে একটা কালো বিড়াল আর নীচে লেখা নাম; জুজু।

মোচড়

মুখের ঠিক কাছে যখন কাকার মুখ আসে, গন্ধ পেলাম মাদকের। কাকা আজ আবার নেশাগ্রস্ত। আমার কাঁধে হাত রেখে বলে, "জীবনে কিন্তু থামবি না কখনও।" তারপর শুয়ে পড়ে।

ঘুম যখন ভাঙে, নিজেকে বিছানায় আবিষ্কার করি; নগ্ন। উঠতে যাব, কোমরের নিচে ব্যথা। তাকিয়ে দেখি রক্ত। যোনি থেকে ক্রমাগত রক্ত বেরোচ্ছে। পাশে তাকিয়ে দেখি কাকা শুয়ে। বুঝতে পারি, আমার অজান্তেই আমার সঙ্গে কিছু একটা হয়েছে।

বিছানা ছেড়ে কোনোরকমে মায়ের কাছে পৌঁছাই। তারপর ছুটতে হয় হাসপাতাল, পুলিশ আর কোর্ট। তিন মাসের নাটক। তবুও শেষমেশ কাকা আজ পকসোর দৌলতে জেলে।

আমি কাকার ঘরে এসে বসি। মায়ের ফিরতে দেরি হবে, তাই সময় আছে। দরজা বন্ধ করে একটা সিগারেট জ্বালাই।

এবার বলি ব্যাপারটা আপনাদের, যারা এতটা পড়লেন। হয়তো মনে হচ্ছে চারদিকে যা খবর চলছে, তারই একটা অংশ পড়লেন। কিন্তু গল্পে একটু মোচড় আছে।

আসলে কাকা অবিবাহিত। কাকার প্রচুর টাকা। রাতে বাড়ি ফেরে মদ গিলে। এত টাকা, বউও নেই, বেকার নষ্ট হবে কেন? আমি নিতেই পারি। তাই শুরু করলাম একটা বড় নাটক; এতক্ষণ যেটা পড়লেন।

আর একটা কথা। ঘুম থেকে উঠে যেখানে রক্ত লিখেছিলাম, ওটা রক্ত ছিল না। ছিল চাদর। নগ্ন তো আমি শুধু গল্পে। কল্পে নয়।

মিসড কল

“সকাল থেকে কোথায় ছিলে তুমি?”

“ঘুমিয়ে।” অনুভব শান্ত। রেগে আজ অরিত্রিকা। শুধু একটা ভুল উত্তর আর সপাটে এক চড় পড়বে গালে।

“ফোনটা তুলবে না, তা বলে?” গলাটা এবার কাঁদো কাঁদো হয়ে আসে। অনুভব চোখে চোখ রেখে বসে।

“ঘুমিয়ে থাকলে কী করে বুঝব যে ফোন বাজছে? তুমি শুনতে পাও ঘুমিয়ে থাকলে?”

“না।”

অরিত্রিকা এবার চুপ। হাতের ওপর হাত রেখে আঙুলে আঙুল ঘোরায়। দুটো চোখ একদম কাছাকাছি। ঠোঁট দুটোর দূরত্ব মাত্র আড়াই ইঞ্চি। কিছু একটা হবে হবে করছে। আর হলোও।

চুমুর স্বাদ আসার আগেই স্বাদ এলো সাদা, গন্ধযুক্ত এক তরলের।

পায়রার পায়খানা।

“ছি!” বলে একসঙ্গেই পিছিয়ে আসে দুজন। ব্যাগের ভেতর থেকে জলের বোতল বের করে ক্রমাগত মুখ ধুতে থাকে। তারপর একে অপরের দিকে তাকায়। ঘেন্নায় হেসে ফেলে দুজনেই।

রাতে, অফিসের কাজে বাইরে থাকার পরেও, আজ দুজনেই ফিরে এসেছে। বিবাহবার্ষিকীটা এবার দুজনেরই মাথায় গেঁথে থাকবে।

ল্যাংচা এবং খুন

“এইবার কি হবে?”

“ কি আবার হবে? পুলিশ আমাদের বরণডালা নিয়ে বরণ করে জেলে ঢোকাবে। না থাকবে চাকরি আর না প্রেম”

“ এই ভয় দেখিও না। কি করবো বলো না? তোমার তো নাকি ওসিডি আছে। কোনো তো কাজে আসুক।”

“ এর সাথে ওসিডির কি সম্পর্ক? কারোর বাচ্চা না হলে তুমি বলবে সে বন্ধ্যা।”

“ না যাইহোক কি করবে সেটা বলো”

“ একটা ল্যাংচা আনো”

“কেনো?”

“ যাতে গলায় ঢুকিয়ে প্রমাণ করতে পারি মৃত্যু হয়েছে প্রাকৃতিক শ্বাসরোধে”

কপোত কপোতী দাঁড়িয়ে এখন ঘরের ভিতর। শুভেন্দু আর শিবানী। তাদের সামনে শুয়ে একটা দেহ। মৃত। দেবাশীষ বড়ুয়া। শিবানীর কাকা।

শুভেন্দুর অনুপস্থিতিতে আত্মরক্ষায় ঘুষি গলার হাঁড়ে আর ব্যাস, ভবলীলা সাঙ্গ। এবার পালা প্রমাণ লোপাটের।

এখন রাত দুটো। সবাই ঘুমিয়ে নিজের মতন। শুভেন্দু ফোন লাগায় অ্যাম্বুলেন্সে। মিনিট পনেরোর মাথায় অ্যাম্বুলেন্স। নিয়ে যায় তাকে। পিছন পিছনে যায় তারা। সারারাত চেষ্টার অভিনয় করার পর ডাক্তার ঘোষণা করে তিনি মৃত। বিল তিনলক্ষ থাকা। তারপর দেহ ছাড়বে পোড়ানোর জন্য।

“ আমি ভেবেছিলাম কেটে তারপর এসিড দিয়ে গলিয়ে ফ্লাশ করবো। ”

“ কেনো অযথা এত খাটবো ? বুড়োর নামে ইন্সুরেন্স আছে? ”

“ আছে মেডিক্লেম।”

“ ব্যাস হয়ে গেল। নিজের মৃত্যুর টাকা নিজেই মেটাক।”

“ সত্যি বাঁচালে তুমি ”

“ ল্যাংচা খাবে? ”

লাল কার্ড

জামার বুকপকেট থেকে লাল কার্ড বের করে শূন্যে তোলে অতনু। এই নিয়ে একই ম্যাচে চারবার একই রং দেখাতে হয়েছে। চারটেই ইচ্ছাকৃত। খেলার মাঠে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের রাগ ঝাড়ার জায়গা নয়, সেটা তারা বোঝে না।

আজ বাড়ি ফিরতে দেরি হয়েছে প্রায় আঠারো মিনিট। খেলার মাঠ থেকে বেরিয়ে অফিস, তারপর বাড়ি। ক্লান্তি জুড়ে বসেছে শরীরের শিরা-উপশিরায়।

মাথা মুছতে মুছতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে উঠোনে দাঁড়ায় অতনু। টেবিল থেকে চশমা তুলে পরতে যাবে, এমন সময় দরজায় ধাক্কা। একবার। দুবার। তিনবার। তারপর থেমে যায়।

কৌতূহলী ভঙ্গিতে দরজা খুলতেই মুখোমুখি সেই চারজন, যাদের জন্য মাঠে লাল কার্ড দেখাতে হয়েছিল। অতনু কিছু বলার আগেই চারজনে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে। তারপরই এক ঘুষি। অতনু মাটিতে।

জ্ঞান ফিরতেই খেয়াল করে, সে চেয়ারে বাঁধা। আশ্চর্যজনকভাবে শান্ত। চারজন তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে।

“কী ভেবেছিলি? আমাদের মাঠে বসিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থাকবি? তা তো সম্ভব নয়, মোনা। তোর জন্য আমাদের টুর্নামেন্ট থেকে বাতিল করল। আর তোকে

ছেড়ে দেব, তা তো হয় না। যাই হোক, তোর প্রেমিকাও কিন্তু আছে আমাদের সাথেই। তোর পা ভেঙে, তারপর ওর সাথে...”

কথা শেষ হওয়ার আগেই এক ধাক্কায় দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ে পুলিশ। প্রত্যেকের হাতে বন্দুক। চারজনই হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়ে। সাথে আছে অতনুর খুব চেনা এক মুখ। প্রিয়াঙ্কা। ঠোঁটে লেগে রক্ত। ছিঁড়ে যাওয়া চুড়িদারের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় অন্তর্বাস। চুল এলোমেলো।

অতনু সামান্য হাসে।

পুলিশ তাদের নিয়ে যায়। প্রিয়াঙ্কা এসে বসে অতনুর পাশে। খুলতে থাকে বাঁধা দড়ি।

“ফাটিয়ে দিয়েছ পুরো তুমি। কী চমৎকার অভিনয়! তুমি আজ না থাকলে কী যে হতো আমার। আমি যদি ঠিক সময়ে জানতে না পারতাম, আজ সম্ভবত আমার শেষ দিন ছিল। পুলিশে ফোন করা, তোমায় সবটা বোঝানো; একদম হিসেবের আঠারো মিনিট।”

“আমি থাকতে তোমার কিছু হতে দিতে পারি? চলো, এবার থানায়। অনেক কাজ বাকি। তারপর না হয় আবার প্রেম করব।” গালে হাত রাখে প্রিয়াঙ্কা। অতনু হাসে।

বাইশে আসিও না

কেকের নরম স্তরে ছুরির ধার যখন নিজের জায়গা করে নেয়, বেরিয়ে আসে টুকরো। একইভাবে চারবার। চার টুকরো। চারজন। প্রত্যেকে নিজের টুকরো হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। কামড় বসে, তারপর প্রশংসা।

শাওনের আজ জন্মদিন। বাইশে শাওন। বন্ধুরা জোর করে কেক কাটিয়েছে। ভালোই লেগেছে। কেউ তো মনে রেখেছে। তারপর সেলফি আর গিফট।

সারা সন্ধ্যা তাদের সঙ্গে কাটিয়ে বাড়ি ফেরে সে। হাতে গিফটের ব্যাগ। বড্ড খুশি।

জামা না খুলেই বিছানায় উঠে বসে। খুলতে থাকে গিফটের মোড়ক। বেরিয়ে আসে চারটে ভিন্ন উপহার। একটা ফাউন্টেন পেন, একটা পারফিউম, একটা মানিব্যাগ আর একটা পেনড্রাইভ। প্রথম তিনটে ভালো লাগলেও শেষের উপহারটাই যেন দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দিয়েছে তৃষা।

কৌতূহল ধরে রাখতে না পেরে পেনড্রাইভটা ল্যাপটপে লাগায়। স্ক্রিনে ভেসে ওঠে একটা ফোল্ডার।

"বাইশে আসিও না"।

ডাবল ক্লিক করতেই খুলে যায়। ভেতরে বাইশটা সাবফোল্ডার। প্রত্যেকটার ওপর একটা করে নাম লেখা। শাওন ঠিক বুঝতে পারে না। একটা একটা

করে খুলতে থাকে। আর ততটাই শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে আসে ভয়। অনুভূতিগুলো যেন নিজেদের মধ্যেই পথ হারিয়ে ফেলে। শরীর ঘামতে থাকে।

প্রত্যেকটা ফোল্ডারে ভিন্ন একজন মেয়ের ছবি।

শাওন ভয়ে ল্যাপটপটা বন্ধ করতেই বেজে ওঠে কলিংবেল। একবার দীর্ঘশ্বাস নিয়ে নিচে নেমে দরজা খোলে। সামনে দাঁড়িয়ে তৃষা। আর পিছনে পুলিশ।

"ঠিক যতজন মেয়ের জীবন নষ্ট করেছিলি, তাদের দেখে ভয় পাচ্ছিস কেন? দেখ, মাথায় ঘাম।" কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলে তৃষা, "চেকমেট।"

খুন এবং রজনীগন্ধা

"স্নান সেরে মায়ের ছবিতে মালাটা পড়িয়ে দিস, মনে করে।" বলে বেরিয়ে যায় বাবা।

আজ বাড়িতেই নীলাগ্নি। অফিসে যেতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু গতকালই দাঁত তুলেছে, তাই আজ ছুটি নিয়ে বাড়িতেই। সদ্য তার মা মারা গেছেন। দুমাস হলো সব কাজ মিটেছে। ভেঙে পড়লেও জীবন ধীরে ধীরে সামলে নিয়েছে নীলাগ্নিকে।

চেয়ারে উঠে মায়ের ছবিতে মালা পরাতে গিয়ে দেখে হাত পৌঁছাচ্ছে না। কোনোরকমে চেষ্টা চালায়। হঠাৎ বাঁধানো ছবিটা খুলে এসে পড়ে তার মুখের ওপর। কোনোমতে ধরে ফেললেও নিজেকে সামলাতে পারে না। চেয়ার থেকে পড়ে দেয়ালে ধাক্কা খায়। হাত ফসকে ছবিটাও পড়ে যায়।

ভেঙে যায় ফ্রেম।

নিজেকে সামলে ভাঙা কাচ সরিয়ে ফটোফ্রেমটা হাতে তুলে নেয়। উল্টে দিতেই অবাক হয়ে যায়। কাঠের পেছনে সেলোটেপ দিয়ে আটকানো একটা কালো কাগজ। তার মাঝখানে লেখা একটা শব্দ ; "খুনি"।

একটানে কাগজটা টেনে বের করে। সামনে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। আলোয় ধরতেই কালো রঙের ভেতর নিজেরই প্রতিফলন ভেসে ওঠে।

ঠিক তখনই দরজা খুলে বাবা ঢোকে।

"তুই কি ভেবেছিলি আমি বুঝতে পারব না কোনটা খুন, আর কোনটা অসুস্থতা?"

"কী বলছ? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।" নীলাগ্নির গলায় অস্থিরতা।

"নিজের মাকে মেরে ফেলার আগে একবারও ভাবলি না? নিজেকে দেখে ঘেন্না হয় না?"

"তোমার হয়েছিল?" চোয়াল শক্ত হয়ে আসে। গলার স্বর শান্ত, অথচ ধারালো।

"আমি তখন ছোট ছিলাম। রোজ রাতে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরতে। বেল্ট দিয়ে মারতে। তারপর সারারাত নির্যাতন। এগারো বছর ধরে সহ্য করেছি। তারপর মা মারা যেতে না যেতেই এই মহিলাকে বিয়ে করে আনলে। তখনও কিছু বলিনি। কিন্তু যেদিন আমার মায়ের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে তোমার বউ মাকে নিয়ে গালাগাল করছিল... সেদিন আর পারিনি। ওর খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলাম।"

"এত রাগ ছিল তোর?"

"ছিল তোমার ওপর। মরল তোমার বউ।"

মৃদু হেসে বলে নীলাগ্নি। বাবার চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে।

ঘেন্নায় নয়; রাগে।

বাজারের ব্যাগ থেকে মাংস কাটার ছুরি বের করে দৌড়ে আসে সে। কিন্তু পা হড়কে যায় রজনীগন্ধার মালায়। সামনে পড়ে থাকা ভাঙা কাচের ওপর গিয়ে আছড়ে পড়ে। গলার গভীরে কাচ ঢুকে যায়। যেভাবে ছোটবেলায় নীলাগ্নি মায়ের মুখে আবির মাখিয়ে দিত, ঠিক সেভাবেই রক্তের ছিটে এসে লাগে মায়ের ছবিতে।

আর কিছুটা এসে পড়ে নীলাগ্নির চোখে।

“বেশ হয়েছে।” হাসে নীলাগ্নি।

হিমি

শহরের বুক জুড়ে আজ শুধু জল আর অবরোধ। রাত থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টির শেষ নেই আজও। মানুষের দৈনন্দিন জীবন ব্যাহত করে নির্লিপ্তভাবে এগিয়ে চলে বৃষ্টি। এরপর আসবে ঝড়।

অরূপ দৌড়াচ্ছে।

কাঁদাজল মাড়িয়ে ক্রমাগত দৌড়াচ্ছে সে। আজ স্নেহা, তার স্ত্রীর ডেলিভারি। কিন্তু এই বিপর্যয়ে গাড়ি নিয়ে বেরোনো সম্ভব নয়। তাই একমাত্র ভরসা— দৌড়। নার্সিং হোম আর মাত্র পাঁচ মিনিট দূরে।

শরীরে আর এগোনোর শক্তি নেই। রাস্তা পার হতে যাবে, ঠিক তখনই একটা গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে পড়ে রাস্তার ধারে। মাথা ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসে। কিন্তু সেই রক্ত বেশিক্ষণ শরীরের থাকে না। বৃষ্টির জলে নিজের ঘনত্ব হারিয়ে মিশে যায় নোংরা স্রোতে।

অরূপ উঠে দাঁড়ায়।

গাড়ি থেকে নেমে আসে একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ। কাছে এসে তাকে ধরে বসায় গাড়িতে। বারবার ক্ষমা চায়। সব কথা শোনে।

"চলো, তোমায় তোমার গন্তব্যে পৌঁছে দিই। তারপর আমিও বেরোব। সময় খুব কম।"

“না না, দাদা। কোনো সমস্যা নেই। আমি হেঁটেই চলে যাব।”

“আরে বসো। তোমাকে সাহায্য না করতে পারলে আমার খুব খারাপ লাগবে। তোমাকে নামিয়ে আমিও যাব... মেয়েকে আনতে।”

“স্কুল থেকে?”

লোকটা মৃদু হেসে মাথা নাড়ল।

“না।”

চোখ খুলেই প্রথম যাকে দেখে, সে অরূপ। হাতে তোয়ালে মোড়ানো ছোট্ট একটা প্রাণ। স্নেহা সজল চোখে দু'হাত বাড়ায়। তাদের সন্তান বাঁচেনি; এ কথা দুজনেই জানে।

তবু অরূপ হাসছে।

মানুষ খুব কষ্ট পেলে অনেক সময় হাসতেই ভুলে যায়। কিন্তু অরূপের চোখে কোনো ক্ষোভ নেই। বরং এক অদ্ভুত শান্তি। সে তোয়ালেটা আলতো করে স্নেহার হাতে তুলে দেয়। ভেতরে ছোট্ট একটা লোমশ খরগোশশিশু নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে।

“মেয়ে?”

“হ্যাঁ... আজ থেকে আমাদের।”

“নাম?”

“হিমি।” অরুপ বলে হেসে।

স্নেহা জড়িয়ে ধরল হিমিকে। আর অরূপ স্নেহাকে।

হয় ভুল নয় ঠিক

“তোমায় আমি কিছু প্রশ্ন করতে পারি?”

সোফায় হেলান দিয়ে বসে জানতে চাইলেন দেবাদৃতা ঘোষ। পেশায় মনোবিদ। তাঁর সামনে চেয়ারে বসে আছে অর্পণ। মানসিক সমস্যার কারণেই এসেছে। গলা পর্যন্ত বোতাম লাগানো জামা, এলোমেলো চুল, ঝকঝকে পরিষ্কার জুতো। দেখতে ভদ্র। তবে যা দেখা যায়, তা-ই সবসময় সত্যি হয় না।

“নিশ্চয়ই।”

“তোমার পুরো নাম?”

“অর্পণ দস্তিদার।”

“কী করো?”

“কমার্স, সেকেন্ড ইয়ার।”

“আচ্ছা, এবার বলো সমস্যাটা ঠিক কী?”

অর্পণ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,

“আমি বুঝতে পারছি না। আমি কারও সাতে-পাঁচে থাকি না। নিজের মতো থাকি, নিজের মতো চলি। কিন্তু কয়েকদিন ধরে এমন সব অভিযোগ শুনছি,

যেগুলোর কিছুই আমার মনে নেই। আমার সবকিছুই মনে থাকে। শুধু এগুলোই যেন নেই।"

"যেমন?"

"আমার প্রেমিকা বলেছে আমি নাকি ওর অনুমতি ছাড়া শারীরিক সম্পর্ক করার চেষ্টা করেছি। মা বলছে আমি নাকি ওদের গায়ে হাত তুলেছি। এমনকি বন্ধুরাও একই কথা বলছে।"

দেবাদৃতা কিছুক্ষণ অর্পণের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন,

"তুমি কি চশমা পরো?"

অর্পণ পকেট থেকে চশমা বের করে চোখে পরতেই মুহূর্তের মধ্যে তার দৃষ্টি আটকে গেল দেবাদৃতার বুকে।

"কী বড়ো..."

কথা শেষ হওয়ার আগেই দেবাদৃতা একটানে চশমাটা খুলে নিলেন।

অর্পণের মুখের অভিব্যক্তি মুহূর্তেই স্বাভাবিক হয়ে গেল।

"কী হলো, ম্যাম?"

দেবাদৃতা কোনো উত্তর দিলেন না। সম্ভবত ডিসোসিয়েটিভ আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডার। আর চশমাটাই ট্রিগার। অন্তত আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হচ্ছে।

তিনি মৃদু হেসে বললেন, "আমায় কেমন লাগছে তোমার?"

“ভালো।”

“চশমাটা আর একবার পরো।”

অর্পণ বাধ্য ছেলের মতো চশমা পরে নিল।

আবারও একই দৃষ্টি।

“এবার?”

“আপনাকে দেখে আমার শরীর গরম হয়ে গেছে। এত হট হয়ে কেন মনোবিদ হলেন? আপনার হাসবেন্ড সত্যিই ভাগ্যবান...”

দেবাদৃতা আর শুনলেন না।

চশমাটা খুলে মেঝেতে ফেলে পা দিয়ে ভেঙে দিলেন। অর্পণ বিস্মিত।

“কী হয়েছে, ম্যাম?”

“এখন তুমি একদম ঠিক আছো। আর কোনো সমস্যা হবে না।”

“সত্যি?”

“হ্যাঁ। দাঁড়াও, একটা ফোন করে আসছি। তুমি বসো।”

দেবাদৃতা ভেতরের ঘরে চলে গেলেন।

অর্পণ নিশ্চিন্তে পায়ের ওপর পা তুলে বসল। টেবিল থেকে জলের গ্লাস তুলে এক চুমুকে শেষ করল। মনে মনে হাসল।

এত সুন্দর অভিনয়ের পর একজন মনোবিদও তাকে ধরতে পারলেন না। নিজের অপরাধগুলো ঢাকতে সে মাসের পর মাস ধরে নির্দোষ মানুষের অভিনয় করে এসেছে। পরিবারের ওপর অত্যাচার, সম্পর্কের নামে সহিংসতা; সবকিছুকেই সে একই নাটকের অংশ বানিয়ে ফেলেছে।

ঠিক তখনই কলিংবেল বেজে উঠল। অর্পণ দ্রুত মুখের ভাব বদলে ফেলল।

দেবাদৃতা দরজা খুললেন। বাইরে দাঁড়িয়ে পুলিশ।

"ভাগ্যিস আমাদের একই অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন," মৃদু হেসে বললেন দেবাদৃতা। "আর একটা কথা..." অর্পণের দিকে তাকালেন তিনি।

"পায়ের ওপর পা তুলে বসা সবাইকে মানায় না, বাবু।"

বেশ/অ্যা

“কত দিবি?”

“পাঁচশোর একটাকাও কম না।”

“ভেবে বলছিস?”

“একদম। ব্যবসায় এত ছাড় দিয়ে পোঁদ মাড়িয়ে আদৌ কোনো লাভ হয়?”

“আর সামনের?”

“হাজার।”

“আটশো দেব। সামনে-পেছনে দুদিকেই।”

“হবে না।”

“শেষবার বলছি। আটশোর একটা টাকাও বেশি না, কমও না।”

“দু'ঘণ্টা। রাজি?”

“রাজি।”

কথা শেষ। দরজা বন্ধ হয় ঘরের। তারপর চলে শারীরিক হিংস্র খেলা।

ঠিক রাত বারোটায় দরজা খোলে। বেরিয়ে আসে লোকটা। বিছানায় নগ্ন শুয়ে আয়েশা। মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে ফেনা। প্রাণহীন।

“অ্যান্ড কাট!”

বলে ওঠে পরিচালক।

শুয়ে থাকা নগ্ন মেয়েটি উঠে দেহে চাদর জড়ায়। বেজে ওঠে হাততালি। ক্যামেরাম্যান এগিয়ে এসে ছবি তোলে তার। মুখের নয়; চাদরে ঢাকা শরীরের।

সকালের মধ্যেই ছড়িয়ে যাবে ইন্টারনেটে।

নীলছবি ঠিক অনেকটা রক্তবীজের মতো; যেখানে শেষ হয়, শুরু হয় সেখান থেকেই।

এক ঘণ্টায় খালি হয়ে যায় সেট। শুটিং শেষ। কিন্তু কাজ নয়। কাজ এবার শুরু হবে। হবে আসা-যাওয়া। খদ্দেরের।

মিত্র

"আজ তোমাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?" শুভ জানতে চায়।

অনমিত্র চুপ করে বসে। চোখের পাতায় উজ্জ্বল স্ক্রিনের আলো।

"তুমি আছো?" ফোনের ভেতর থেকে আবার জানতে চায় শুভ।

অনমিত্র ভেঙে পড়ে কান্নায়। শুভ বুঝতে পারে, কিন্তু কিছু করতে পারে না। ফোনের ভেতর থেকে সান্ত্বনা দেওয়া যায়, জড়িয়ে ধরা যায় না।

"আছি। আসলে স্কুলে আজ সবাই খুব মেরেছে, জানিস। খুব মেরেছে। কারণ আমি বাকিদের মতো ফর্সা নই। কালো। তাই বাকিদের আমাকে পছন্দ নয়।"

"কেঁদো না, মিত্র। একটা কথা বলো তো? তোমার আর ওদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?"

"রঙে।"

"ওরা কি মানুষ নয়?" অনমিত্র উত্তর দিতে পারে না।

"মানুষ যদি সবাই একই রঙের হয়, তাহলে পার্থক্য জন্মাবে কোথায়?"

"কিন্তু..."

“আরেকটা প্রশ্নের উত্তর দাও। তোমার থেকেও তামাটে রঙের ছেলে-মেয়ে আছে, অনেকে গরিব, অনেকে প্রতিবন্ধী। তুমি কি তাদের দেখে হাসো, বা তাদের দুর্বলতার সুযোগ নেওয়ার কথা ভাবো?”

“না।”

“পার্থক্যটা এখানেই, মিত্র। রঙে নয়; চরিত্রে।”

“বুঝলাম।”

অনমিত্র হাসে। প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছে সে। শুভর চেয়ে ভালো বন্ধু নেই তার। কারণ শুভই তার একমাত্র বন্ধু।

“ঠিক আছিস?”

“হ্যাঁ, আছি এবার। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি খেয়ে আসি।”

“হ্যাঁ, আয়।”

উঠে পড়ে সে। ফোনটা চার্জে লাগিয়ে বন্ধ করে দেয় তার বানানো অ্যাপ্লিকেশন। মিত্র.এআই।

ফাঁক

“কী খাবে তুমি?”

“শুধু ভাত আর ডাল বলো।”

“আর কিছু?”

“না। যথেষ্ট।”

অর্ডার দিয়ে বসে থাকে দুজনেই। কথা নেই।

কিছুক্ষণ পর টেবিলের দুদিকে আসে দু ধরনের খাবার। একদিকে ভাত-ডাল, অন্যদিকে ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন। দেবমাল্য বাঁচে ভাতে, আর শ্রেয়া; প্রাচুর্যে।

থালা টেনে কাছে এনে ভাতের জমানো শহর ডালের স্রোতে ভেঙে ফেলে দেবমাল্য। তারপর গ্রাসে গ্রাসে গিলতে শুরু করে। শ্রেয়া কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে, তারপর মন দেয় নিজের থালায়। দৃষ্টিটা কৌতূহলের, নাকি বিতৃষ্ণার; বোঝা যায় না।

সদ্য বিয়ে হয়েছে দুজনের। অনিচ্ছায়। দুজনের পায়ের মাটি এক, তবে পায়ের খোলস এক নয়। একজন পরে হিলস, অন্যজন হাওয়াই চটি। সমাজের চোখে পার্থক্যটা এখানেই।

“কত হলো আমাদের?”

রিসেপশনের সামনে দাঁড়িয়ে জানতে চায় দেবমাল্য। শ্রেয়া দিতে চায়, কিন্তু আটকায় সে।

“পাঁচশো এক টাকা।”

মানিব্যাগ খুলে পাঁচশো টাকার নোট বের করে দেবমাল্য। কিন্তু এক টাকার কয়েন পাচ্ছে না। সকালেও ছিল। এখন নেই। ব্যাগটা টানতেই সে থেমে যায়। তলায় একটা ফাঁক। কয়েনটা হয়তো সেখান দিয়েই গড়িয়ে গেছে। ফাঁক দিয়ে নিচে তাকাতেই চোখে পড়ে ছোট্ট গোলাকার কয়েনটা। মুখে হাসি ফুটে ওঠে তার। ঝুঁকে পড়ে সেটা কুড়োতে। ঠিক তখনই প্রচণ্ড শব্দ। কানের পর্দা যেন ছিঁড়ে যায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ডান পাশ থেকে উষ্ণ রক্ত ছিটকে এসে লাগে মুখে। চোখ বন্ধ হয়ে যায়।

চিৎকার।

চোখ খুলতেই দেখে, শ্রেয়ার শরীর মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। ওপরে তাকায় সে। দাঁড়িয়ে সায়ন। শ্রেয়ার প্রাক্তন। বিয়ের পর থেকেই দেবমাল্যকে খুন করার সুযোগ খুঁজছিল সে। আজ সুযোগ এসেছিল। কিন্তু ভাগ্য রেখে দিয়েছিল সামান্য একটা ফাঁক।

হিংসায় অন্ধ হয়ে সে মেরে ফেলল, যাকে বাঁচাতে চেয়েছিল। দেবমাল্য মাটিতে বসে পড়ে।

প্রাণের দাম তবে এক আনা।

খোলস

“সেদিন সাপের খোলস দেখলাম জানো। সূক্ষ্ম, তবে সুন্দর। চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে হাতে তুলে নিয়েছিলাম। তারপর রেখে দিয়েছিলাম ব্যাগের ভিতর। আজ নিয়ে এসেছি। দেখবে তুমি?”

একরাশ উৎসাহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করে কৃষানু।

অনন্যা আগ্রহী, কিন্তু সেই আগ্রহ প্রত্যাশিত অলৌকিকের দাসত্ব ছাড়াতে পারে না।

“এটা কিন্তু লাইব্রেরি। গল্প করার জায়গা নয়।” বলে ওঠেন লাইব্রেরিয়ান। চুপ করে পড়াশোনায় মন দেয় দুজনেই।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে পড়ে তারা। ঘড়ির কাঁটা সূর্যাস্তের ইঙ্গিত দিচ্ছে। মাথায় ছাতা, কাঁধে ব্যাগ আর একটা জলের বোতল।

“জল খাবি?”

জানতে চায় অনন্যা।

“প্রচণ্ড গরম কিন্তু।”

কৃষানু বোতল হাতে নিয়ে এক ঢোক খেয়ে আবার ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখে।

“এবার কোথায় যাবি? বাড়ি, না ঘাটে?”

জিজ্ঞেস করে কৃষানু।

“বাড়ি আজ ফাঁকা আছে আমার। আসতে চাইলে আসতেই পারিস।”

দুষ্টুমি মেশানো গলায় বলে অনন্যা। চোখে চোখ রাখে।

“বাকিটা তোর ইচ্ছা।”

বলে এগিয়ে যায় সে।

দশ সেকেন্ড ধরে কথাটার মানে বোঝে কৃষানু। তারপর বুঝে এগিয়ে আসে। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অনন্যার কানের কাছে ঠোঁট এগিয়ে বলে,

“বলছিস যখন ভালোবেসে, না গেলে আবার মহাদেব পাপ দেবেন।”

হেসে ওঠে দুজনেই।

“আর প্রোটেকশন?”

“আছে।”

আবার চোখে চোখ রাখে অনন্যা। কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে থাকে তারা।

বাড়ি এসে ব্যাগ রাখতে না রাখতেই ঠোঁটে ঠোঁট মিশে যায় দুজনের। মুহূর্তের মধ্যে দাঁড়ায় একে অপরের মুখোমুখি। নগ্ন। বিছানায় উঠে আসে অনন্যা। কৃষানু এখনও দাঁড়িয়ে।

“শিলাজিৎ কিনে রেখেছি, খাবে?” অনন্যা জানতে চায়।

“হ্যাঁ, আগে বলবে তো। দাও তাড়াতাড়ি।”

হাত থেকে একটা ট্যাবলেট নিয়ে জিভে রাখে। তারপর জল খায়।

এরপর মেতে ওঠে শারীরিক উত্তেজনার খেলায়। ঘরের কোণে কোণে ভেসে আসে তৃপ্তির চিৎকার। অনেকক্ষণ পর দুজনেই থামে। পরিতৃপ্তির অভিব্যক্তি দুজনেরই মুখে। কৃষানু মাথা রাখে অনন্যার খোলা বুকে। শুনতে থাকে তার হৃদস্পন্দন।

প্রায় দশ মিনিট কেটে যায়। কৃষানুর কোনো সাড়া নেই। অনন্যা নিজের বুক থেকে ওর মাথা সরিয়ে উঠে বসে। নাকের কাছে হাত নিয়ে বুঝতে পারে, প্রাণ নেই।

পাশের ড্রয়ার থেকে বাজতে থাকা ফোনটা তুলে কানে ধরে।

“কাজ হয়েছে?”

“হ্যাঁ, হয়েছে। সকালে আমায় সাপের খোলস দেখাচ্ছিল।”

হাসে অনন্যা। ফোনের ওপার থেকেও ভেসে আসে হাসির শব্দ।

“ভাগ্য আছে বলতে হবে। একই দিনে খোলস পেয়েছে, আর পেয়েছে ছোবল।”

“কিন্তু সাপ খোলস ছেড়ে আসে নিজেকে বাঁচাতে। তুমি সেই যোগ্য নও।”

বলে বিছানার একপাশে শুয়ে থাকা নগ্ন পুরুষদেহ। অনন্যা স্থির। চোখে-মুখে আতঙ্ক।

কৃষানু উঠে বসে।

মুখ খুলে জিভের তলা থেকে বার করে আনে ছোট্ট কালো অবয়বটা।

ট্যাবলেট।

ক্যাটাবেসিস

“ নতুন বাড়িতে আসার পর প্রতিদিন রাতেই যেনো কিছু একটার শব্দ শুনতে পেতাম নীচ থেকে। বাড়িটা ছিল দুতলা। আমি থাকতাম উপরের ঘরে। ঠিক রাত দুটোয় শুনতে পেতাম এক আওয়াজ। আমার নাম ধরে কেউ যেনো ডাকছে। আমি রোজ নিজের ভ্রম ভেবে শুয়ে থাকতাম কিন্তু কাল কী হলো বুঝলাম না। নিজেকে আর আটকে রাখতে পারিনি। শব্দের রেশ ধরে নেমে পড়ি নীচে। খুঁজতে থাকি উৎস। হাঁটতে হাঁটতে দাড়াই এসে রান্নাঘরের মাঝামাঝি। কার্পেটের ঠিক ওপরে দাঁড়িয়ে শুনতে পারি আমার নাম যেনো আরও স্পষ্ট। আমি কোনোরকমে কার্পেট সরিয়ে ফেলতেই দেখতে পাই একটা দরজা। প্রচন্ড অবাক হই। অজানার ভয় জমতে থাকে আমার কপালের ভাঁজে। আমি একটা টর্চ হাতে নিয়ে টান মারি দরজায়। ধুলোর শহর যেনো গিলে ফেলে আমার চোখ মুখ। হাত ঢেকে মুখে উঠে দাড়াই। হঠাৎ কী মনে হওয়ায় নিজের ঘর থেকে নিয়ে আসি আমার রিভলবার। এয়ারগান। একটানা শ্বাস নিয়ে নামতে থাকি নীচে। পুরোনো কাঠের সিঁড়ি। যত নীচে নামতে থাকি আলোর পিছনের জায়গা করে নেয় আঁধারের দাসত্ব। গুনে গুনে ঠিক আঠাশ সিঁড়ি নেমে সন্ধান পাই পাতলাঘরের। সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো একটা ঘর। রিভলবার তাক করে টর্চের আলো ফেলি সামনে। একটা দরজা। আমি কিছু না ভেবে খুলতে না খুকতেই সামনে থাকা দৃশ্য যেনো আমার পা জমিয়ে দেয়। একটা মানুষ আটকানোর একটা কাঠের ক্রুসে। পা বাঁধা। হাত দুটো

পেরেক দিয়ে কাঠে লাগানো। আমি এগোতে পারি না, না পারি পিছতে। আমার নাম আর ডাকছে না কেউ। মাথায় অনেক প্রশ্ন জমতে শুরু করে কিন্তু উত্তর পাই না। লোকটা এখন বেঁচে বুঝতে পারি। কোনোরকমে পা ফেলে সামনে এগিয়ে মুখ ঢেকে ফেলা চুল সরিয়ে আলো ফেলতেই পিছিয়ে আসি দশ পা। শিরদাঁড়ায় জমে গেছে ভয়। সামনের মানুষটা আমিই। আর তখনই ঘুম ভেঙে যায় আমার" বলে থেমে দাড়াঁয় অগ্নি। স্নেহাশিস একগ্লাস জল এগিয়ে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলে হাতে। " এই এক স্বপ্ন বার বার আসছে "

" একটা শব্দের অস্তিত্ব কখনও শুনেছ কিনা জানিনা, আজ বলি। গ্রিক শব্দ ; ক্যাটাবেসিস। আমি তোমায় এখন ব্যাখ্যা দেবো না তবে জেনে রেখো তুমি যা দেখছ তার সাথে তোমার অতীত আর বর্তমান জড়িয়ে আছে। "

" বুঝলাম না "

" একটা প্রশ্ন করব। একেবারে সৎ হয়ে উত্তর দিও। নাহলে এড়িয়ে যেও।" কিছুক্ষণ চুপ করে বসে অগ্নি। তারপর শিরদাঁড়া সোজা করে বসে।

" বলুন।"

" তুমি নিজেকে বাঁচাতে চাইছো নিজের থেকেই ? " দৃষ্টি যেনো আবেগহীন।

" হ্যাঁ চাইছি। কিন্তু পারছি না। আগেও দুবার পারিনি।" একটু থেমে গ্লাস দিয়ে জল খায় আবার " আমি পছন্দ করিনা জানেন যখন আমি নিজের

কোনো ব্যক্তিগত কথা কাউকে জানাই। কিন্তু নিজে ঠিক হতে পারিনা তাই জানাতে হয় আগের দুই মনোবিদকে। লাভের লাভ কিছু হয়নি।"

" কি করা থেকে আটকাতে পারোনি নিজেকে ?" প্রশ্নের জবাবে ব্যাগ থেকে বেরিয়ে আসে একটা স্ক্রুড্রাইভার। পাঁচ সেকেন্ডের নিঃশব্দ।

তারপর উত্তর আসে

" খুন "

প্যারালাক্স

“ আমি মিথ্যে বলছি না। আমি নিরপরাধ। বিশ্বাস করো মা”

“ তুই বিশ্বাসের যোগ্য নোস। তোর একবিন্দুও লজ্জা হয় না মিথ্যে বলতে? একটা মেয়ের জীবন শেষ করে আমায় বলছিস তুই কিছু করিসনি? ”

“ আমি মেয়েটাকে চিনি পর্যন্ত না। সবাই ভুল বুঝছে, ভেবেছিলাম তুমি আমায় বুঝবে। ” চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে লোহা ধরে থাকা হাতের ওপর। মা আর ছেলের মাঝে দূরত্ব লোহার দরজার। এপারে মা, ওপারে সন্তান। একমাস আগে ধর্ষণের অভিযোগে আটক করা হয় তাকে। মা, দেখা করতে আসেন তবে কখনও যাচাই করে দেখেননি আদৌ ছেলে তার কিছু করেছে কি না।

“ সেদিন রাতে অফিস ফেরার পথে। আমি নির্জন গলিতে মেয়েটাকে পেয়েছিলাম সেই অবস্থায়। আমি খালি কাছে গিয়ে মেয়েটার শ্বাস চলছে কিনা দেখতে গেছিলাম আর তখনই কারা যেনো আমায় দেখে ফেলে পুলিশে খবর দিল আর তুমিও সবটা বিশ্বাস করে নিলে। মেয়েটাও জানে না তার সাথে কে কি করেছে। মেয়েটা দৃষ্টিহীন। দোষ হলো সব আমার। আমার নখে মেয়েটার স্কিন সেল, মেয়েটার যৌনাঙ্গে আমার সিমেন কিছু পেয়েছে? আইন এতটা অন্ধ? ” লোহার মোটা দরজায় ধাক্কা মারে অয়ন। পাশে বসে থাকা কনস্টেবল ঝাঁঝিয়ে ওঠে “ তোমার বাপের ঘর নয় এটা। করার সময় মনে

থাকে না এখন ন্যাকামি মারাচ্ছ?" অয়ন কিছু বলে না। মাও চুপ। কিছু না বলেই বেরিয়ে যায়। অয়ন ফিরে যায় নিজের কোণে। হাঁটুমুড়ে কাঁদতে থাকে বসে।

মহাদেবের আশীর্বাদে হয়তো ছেলের কথাগুলো ভাবতে শুরু করে তিনি। অয়নের গল্পে হঠাৎ জেগে বসে তার মা। আগেরদিনের সব কথা যেনো ভেবে দেখেছেন শেষমেশ তিনি। একমাসের মধ্যে প্রমাণ সমেত ছাড়িয়ে আনে তাকে।

কেটে যায় তারপর এক সপ্তাহ। ধরা পড়ে না আসল অপরাধীদের তবে মুক্ত হয় নিরপরাধ যে। অয়ন এখন আবার ঢুকেছে কাজে। আইটি। কাজ করছে বসে এমন সময় কেঁপে ওঠে ফোনটা। একটা মেসেজ। নাম্বার অপরিচিত। ভিতরে উপস্থিত লোকেশন আর সময়; আটটা আটান্ন।

রাত তখন আটটা বেজে আটান্ন। জ্বলছে কিছু ল্যামপোস্ট। রাস্তা ফাঁকা। চেনা চেনা লাগলেও চিনতে পারে না অয়ন রাস্তাটাকে। হঠাৎ এমন সময় পিছন থেকে একটা ভারী হাত এসে পরে কাঁধে। পিছনে তাকায় অয়ন। সচকিত।

" তোমার বোতামটা সেদিন পেয়েছিলাম এখানে। রেখে দাও" বলে পিছনে দাঁড়ানো ছায়ামূর্তি। অয়ন নিস্তব্ধ।

অ্যাপোফেনিয়া

ক্যামেরার ভিউ ফাইন্ডারে চোখ রেখে তাকিয়ে শতদ্রু। আজ সূর্যাস্তের আগে একটা ভালো ছবি তুলতে না পারলে আজকের দিনটাও নষ্ট। ক্রমাগত এদিক ওদিক খোঁজার পর চোখ আটকেছে দেওয়ালে। দেওয়ালের সিমেন্টের ফাটলগুলো যেভাবে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে, সেই জায়গাটুকু একমনে দেখলে লাগছে যেনো কেউ তাকিয়ে তোমার দিকেই। স্থির তবে দৃষ্টির মধ্যে যেন উপস্থিত আবেগের বীজ। শতদ্রু বুঝতে পেরেই দাঁড়িয়ে যায়। তুলতে থাকে ছবি আর তারপরই সাবমিট। প্রতিযোগিতা জিতবে কি না জানা নেই তবে এমন কিছু পেয়েছে যা পাওয়ার নয়।

“ একটা ছবি দেখবি? ” জানতে চায় শতদ্রু। পাশে বসে প্রাপ্তি। তার প্রেমিকা।

“ দেখা”

“ এই দেখ” উৎসাহী হয়ে ফোনটা তুলে ধরে সামনে। প্রাপ্তি বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেও বুঝতে পারে না। একটা দেওয়াল আর মাঝে কিছু গর্ত। এখানে দেখার মতন যে কিছু আছে তা ঠিক বুঝল না সে।

“ কিছুই তো নেই। ” বলে প্রাপ্তি। শতদ্রুর চোখে তখন বিরক্তির দৃষ্টি।

“ সত্যিই তোরা কি সাধারণ। দেওয়ালে এত সুন্দর একটা মুখ আঁকা এই তুই দেখতে পারছিস না।” বলে উঠে পড়ে শতদ্রু। প্রাপ্তিকে একা রেখেই চলে যায় সে।

কেটে যায় প্রায় একসপ্তাহ। অনেকমাস পর তারা ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। প্রাপ্তি তখন দাঁড়িয়ে তার চোখের ঠিক সামনে। নগ্ন।

“কি সুন্দর লাগছে মুখটা” বলে ছবি তোলে শতদ্রু। কিন্তু তার মুখের নয়, গলার নিচে থেকে হাঁটুর আগে পর্যন্ত।

“ তোর স্তনবৃন্ত আর যৌনাঙ্গ একসাথে দেখলে মনে হয় ওরা যেনো আমায় দেখছে, কাছে ডাকছে আমায়” শুনে রেগে যায় প্রাপ্তি। গায়ে চাদর মুরে শুয়ে পড়ে পাশে। শতদ্রু ভাবলেশহীন। বসে একটানা দেখতে থাকে ছবিটা।

তারপর কেটে যায় আরও একমাস। দুজনে এখন বসে মনোবিদ দেবলীনা দেবশর্মার কাছে। শতদ্রুর চোখ বন্ধ। হাতে ধরে প্রাপ্তির।

“ মুখ সত্যিই খুব অদ্ভুত। কখন সুন্দর থেকে ভয়াবহ হয়ে ওঠে আমরা ধরতে পারি না।” বলে নিশ্বাস ফেলে দেবলীনা

“ ঠিক হবার কোনো উপায়? ” জানতে চায় প্রাপ্তি।

“ একবার চোখের কাপড়টা খোলো” কথা শুনে চোখের কাপড় খুলে ফেলার পরেও বেশ কিছুক্ষণ চোখের পাতা বন্ধ রাখে শতদ্রু। তারপর কোনোরকমে সাহস জোগাড় করে খুলতে না খুলতেই কাঁচের টেবিলে নিজের মুখ দেখে মুহূর্তে মধ্যে পেনস্ট্যান্ড থেকে পেন তুলে নিয়ে ঢুকিয়ে ফেলে নিজের চোখের

ভিতর। প্রথমে বামচোখ, তারপর ডান। রক্ত ছিটকে এসে পড়ে টেবিলে। আর ঘরে চিৎকার। টেবিলের মধ্যে পড়ে থাকা রক্তবিন্দু স্থান নেয় নিজেদের মতন করে। জন্ম দিয়েছে একটা মুখ।

Scan অ্যান্ড Submit